WHAT IS To BE DoNE?

ইসলামবিদ্বেষ, উগ্র-সেক্যুলারিসম

এবং বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়ের ভবিষ্যৎ

> كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ <

সূচীপত্র

পর্ব ১। প্রশ্ন

সমাজ ও রাষ্ট্রে ক্রমশ বাড়তে থাকা ইসলামবিদ্বেষ ও সেক্যুলারায়নের মোকাবিলা, এবং বাংলার মুসলিমদের দ্বীন ও আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখতে হলে কী করণীয়?

এ প্রশ্ন নিয়ে আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন। এ জন্য প্রথমেই দরকার নিছক ইস্যুভিত্তিক লেখালেখি, বক্তব্য, হইচই আর কর্মসূচীর প্রবণতা থেকে বের হয়ে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে শেখা। স্বাভাবিকভাবেই সামসাময়িক ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে আবেগ কাজ করে। কিন্তু আবেগ সাময়িক। আবেগ দ্রুত বদলায়। আমাদের প্রয়োজন শরীয়াহর আলোকে, বাস্তবতার নিরিখে ঠান্ডা মাথার যৌক্তিক বিশ্লেষণ। আর কার্যকরী বিশ্লেষণের ভিত্তি হল বাস্তবতা ও বিদ্যমান সমস্যাকে সঠিকভাবে বোঝা।

আমি সংক্ষেপে আমাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছু পয়েন্ট বলছি

১। বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রে সিস্টেমিক (systemic/নিয়মতান্ত্রিক/কাঠামোগত) ইসলামবিদ্বেষ আছে। সমাজ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষা, মিডিয়াতে উপস্থাপন, প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন দিকে ইসলামবিদ্বেষ গেঁথে আছে। যেসব ক্ষেত্রে লিখিত বা প্রকাশ্যভাবে ইসলামবিদ্বেষ নেই, সেখানেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অলিখিতভাবে আছে ব্যাপক ইসলামবিদ্বেষ। হিজাব, দাড়ি, ইসলামের বিধিবিধান কিংবা মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে বৈষম্য ও ঘৃণামূলক যেসব মন্তব্য, মনোভাব বা অপরাধ আমরা দেখি, সেগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা না। বরং এই নিয়মতান্ত্রিক ও কাঠামোগত ইসলামবিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ।

২। সক্রিয়ভাবে ইসলামবিদ্বেষ ধারণ করা লোকেরা সংখ্যায় অল্প। কিন্তু মিডিয়া, সাংস্কৃতিক অঙ্গন, নাগরিক সমাজ এবং প্রশাসনের বিশাল অংশকে নিয়ন্ত্রন করে এরাই। এই অংশটি সমাজের বাকি অংশকে তাদের কলতাকা ও পশ্চিমা বিশ্বকেন্দ্রিক আকীদাহয় দীক্ষিত করতে চায়। এই ইসলামবিদ্বেষীদের অল্পসংখ্যক হিন্দু কিন্তু অধিকাংশই নামধারী মুসলিম।

৩। বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামবিদ্বেষের পেছনে দুটি প্রধান শক্তি রয়েছে। একটি অভ্যন্তরীন একটি বাহ্যিক। অভ্যন্তরীনভাবে বাংলাদেশে ইসলামবিরোধীতা প্রতিষ্ঠার পেছনে সক্রিয় শক্তি হল সেক্যুলার-কালচারাল এলিট গোষ্ঠী। যারা নিজেদের প্রগতিশীল, সুশীল সমাজ, ইত্যাদি বলে থাকে। বাংলাদেশে ইসলামবিরোধিতার পেছনে প্রধান বাহ্যিক শক্তি হল ভারত। ভারত তাদের আঞ্চলিক ভূরাজনৈতিক স্বার্থসহ বিভিন্ন কারণে ইসলামকে হুমকি মনে করে। বিশেষ করে তাদের পূর্ব সীমান্তে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির উত্থান ভারতের কাছে অগ্রহণযোগ্য। অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক গোষ্ঠী দুটো একে অপরের সহযোগী।

অ্যামেরিকার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা জোটও বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির উত্থানের বিরোধী। দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে তারা ভারতের ঘনিষ্ঠ মিত্র। অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের ব্যাপারে তাদের এবং ভারতের নীতি এক ও অভিন্ন। তবে তাদের বিরোধিতার ধরণ অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা। ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করা যায়। অ্যামেরিকা-ইউরোপ মুসলিমদের ওপর যুলুম করে, যেমনটা আমরা আফগানিস্তান কিংবা ইরাকে দেখেছি। আবার ভারতও মুসলিমদের ওপর যুলুম করে, যেমনটা আমরা কাশ্মীরে এবং বর্তমানে ভারতের ভেতরে দেখছি। দুটোই বিরোধিতা কিন্তু দুটোর ধরণ, মাত্রা, তীব্রতা এক না। তাছাড়া নিকটবর্তিতা এবং ঐতিহাসিক কারণে বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর ভারত যেভাবে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব তৈরি করতে পেরেছে, সংগত কারণে পশ্চিমাদের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি।

৪। বাংলাদেশের মুসলিমরা এই যমিনের সন্তান। তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত। মুসলিমরা এবং তাদের অনাগত উত্তরসূরীরা এ মাটিতেই থাকছে, কোথাও যাচ্ছে না। মুসলিমরা এই মাটির ওপর দাবি ছাড়বে না।

৫। মুসলিমরা ইসলাম ছাড়বে না। মুসলিমরা গুনাহগার হতে পারে, কিন্তু ইসলামের কোন বিধানকে অস্বীকার বা অকার্যকর করা তাদের পক্ষে সম্ভব না। হিজাব-নিকাব-দাড়ি-টুপি থেকে শুরু করে অন্য কোন কিছুই মুসলিমরা ত্যাগ করবে না।

৬। মিডিয়া, মানবাধিকার সংস্থা, বুদ্ধিজীবি, সেক্যুলার বিভিন্ন সেলিব্রিটি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সম্প্রদায়—এদের কেউই মুসলিমদের পক্ষে কথা বলবে না। বরং মুসলিমরা আক্রান্ত হলেও এদের বড় একটা অংশ মুসলিমদেরকেই আগ্রাসনকারী হিসেবে তুলে ধরবে। ৫-ই মে এবং মোদীবিরোধী আন্দোলনের 'তাণ্ডব' সংক্রান্ত মিডিয়া কাভারেজ এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

৭। সরকার (যেকোনো সরকার)-এর কাছে দাবি জানিয়ে তেমন কোন লাভ নেই। যেকোনো সেক্যুলার সরকার বাংলাদেশের সেক্যুলার-কালচারাল এলিট (ইসলামবিদ্বেষী শক্তি), ভারত এবং অ্যামেরিকাকে খুশি রাখার চেষ্টা করবে। কাজেই সরকার বদলালে সাময়িকভাবে কেবল ইসলামবিদ্বেষের মাত্রার পরিবর্তন ঘটবে, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে গেঁথে যাওয়া কাঠামোগত ইসলামবিদ্বেষের সমাধান হবে না। এসব ক্ষেত্রে সরকার কেবল তখনই মুসলিমদের স্বার্থ আমলে নেবে যখন তারা দেখবে এই ধরনের ইস্যুতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া তাদের জন্য রাজনৈতিকভাবে নেতিবাচক।

৮। শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে স্ট্যাটাস কৌ (বিদ্যমান অবস্থা) পরিবর্তনের মতো সামাজিক কিংবা অন্য কোন ধরণের সক্ষমতা বাংলাদেশের মুসলিমদের বর্তমানে নেই।

৯। যদি অন্য সকল চলক অপরিবর্তিত থাকে (ceteris paribus), তাহলে বাংলাদেশে ইসলামবিদ্বেষ এবং ইসলাম পালনের কারণে বৈষম্যের শিকার হবার মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। ইসলামী বই বেস্টসেলার হওয়া, ফেইসবুকের পোস্টের লাইক-শেয়ার, ইউটিউবে ওয়াজের ভিডিওর ভিউয়ের সংখ্যা বাড়ার মত বিষয়গুলো ইতিবাচক হলেও, এগুলোর মাধ্যমে এ বাস্তবতা বদলাবে না। দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশে মুসলিমদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের এই কাঠামোগত ইসলামবিদ্বেষের বাস্তবতাকে অবস্থাকে বদলাতে হবে।

১০। শরীয়াহর অবস্থান থেকে সেক্যুলার শাসনব্যবস্থার অংশ হবার সুযোগ নেই। অন্যদিকে বাংলাদেশে কোন ইসলামী রাজনৈতিক দলের পক্ষে বিদ্যমান অবস্থায় এবং নিকটবর্তী ভবিষ্যতে একক ও ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব না। তাছাড়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ ঐতিহাসিকভাবে মুসলিমদের কাজে আসেনি। বরং এতে করে বিদ্যমানতাকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। মুসলিমের সীমিত সম্পদ, সময় ও লোকবল এই ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে নষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে ক্রমশ ছোট হয়ে এসেছে মুসলিমদের নিজস্ব বলয়। কমেছে সমাজ ও রাষ্ট্র ইসলামের প্রভাব। বিকৃতি ঘটেছে মুসলিমদের রাজনৈতিক চিন্তার। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করা ওষুধের বদলে রোগীকে বিষ দেয়ার মতো।

ওপরের ১০টি পয়েন্টের হল পরবর্তী আলোচনা বেইসলাইন বা মূলভিত্তি। এই পয়েন্টগুলোর ব্যাপারে একমত হওয়া সম্ভব হলে, এগুলোকে সামনে রেখে করণীয় এবং সম্ভাব্য কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই তারা চিন্তা শুরু করতে পারি।

পর্ব ২।কালচারাল হেজেমনি (Cultural Hegemony)

কার্ল মার্ক্সের ধারণা ছিল পুঁজিবাদী সমাজগুলো অবধারিতভাবে এক পর্যায়ে সোশ্যালিস্ট/সমাজতান্ত্রিক সমাজে, আর তারপর একসময় কমিউনিস্ট সমাজে পরিণত হবে। মার্ক্সের ধারণা অনুযায়ী ইউরোপের অ্যাডভ্যান্সড পুঁজিবাদী অর্থনীতিগুলো; বিশেষ করে ব্রিটেন, ছিল সোশ্যালিসম এবং কমিউনিসমের জন্য সবচেয়ে উর্বর ভূমি। মার্ক্স মনে করতো, খুব শীঘ্রই সর্বহারা তার দাসত্বের বাস্তবতা অনুধাবন করে বিদ্রোহে জেগে উঠবে। বুর্যোয়াদের পতন ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করবে মার্ক্সিস্ট কল্পরাজ্য।

কিন্তু গত শতাব্দীর শুরুর দিকে নিও-মার্ক্সিস্ট চিন্তাবিদরা একটা সমস্যার মুখোমুখি হল। তারা দেখতে পেল মার্ক্সের ভবিষ্যৎবাণী মিলছে না। ইউরোপের অ্যাডভ্যান্সড সমাজগুলোতে সর্বহারাদের উপলব্ধি আসছে না। কাঙ্ক্ষিত বিপ্লব আসছে না।

হিসেব কেন মেলে না? কেন ইংল্যান্ড কিংবা জার্মানীতে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব আসছে না? কেন শ্রমিকরা এতো ভয়াবহ নির্যাতন ও শোষণের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহ করছে না?

যেসব নিও-মার্ক্সিস্ট চিন্তাবিদ এই প্রশ্নগুলোর জবাব খোজার চেষ্টা করেছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাতদের একজন হলেন ইটালির অ্যান্টোনিও গ্র্যামশি (Antonio Gramsci, মৃত্যু, ১৯৩৭ ঈ.)। এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে গ্র্যামশি বললেন, জনগণের ওপর নিয়ন্ত্রন কেবল সংসদ কিংবা ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে আসে না। সত্যিকারের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রন প্রায় অবধারিতভাবে চালিত হয় সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রন দ্বারা।

কিভাবে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রন অর্জিত হয়? কিভাবে একটা সমাজের প্রভাবশালী শ্রেনী বা গোষ্ঠী তাদের প্রভাব অর্জন করে? একবার প্রভাব ও ক্ষমতা অর্জনের পর কিভাবে তারা সেটা টিকিয়ে রাখে? প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলো এমন সামাজিক কাঠামো তৈরি করে যা জনমানুষের স্বার্থবিরোধী। তবু তাদের ক্ষমতা টিকে থাকে কীভাবে? কেন মানুষ তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না? কিভাবে সর্বহারা এতো সহজভাবে এমন একটা ব্যবস্থায় অংশ নেয় যেটা আসলে তাকে দাস বানিয়ে রেখেছে?

এই প্রশ্নগুলোর জবাবে গ্র্যামশির উত্তর হল – *কালচার, সংস্কৃতি*।

গ্র্যামশি বললেন, ইউরোপের অ্যাডভ্যান্সড পুঁজিবাদী সমাজে সর্বহারার বিপ্লব আসছে না, কারণ এ দেশগুলোর শক্তিশালী সংস্কৃতি আছে। সংস্কৃতির প্রচার করা এবং টিকিয়ে রাখার জন্য আছে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। এই সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো মিলেই বিদ্যমান ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখছে। সর্বহারাকে আটকে রাখছে বিপ্লবী হওয়া থেকে। এসব সমাজে বিপ্লব হচ্ছে না, কারণ এখানে একটা নির্দিষ্ট ধরণের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আধিপত্য আছে।

মানুষ কী চায়, মানুষের আকাঙ্ক্ষা কী, মানুষ স্বপ্ন কী–এগুলো ঠিক করে দেয় কালচার। পুঁজিবাদী সমাজের কালচার মানুষের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রন করে। সর্বহারাকে দাস বানিয়ে রাখে। সাংস্কৃতিক আধিপত্য বা কালচারাল হেজেমনি হল ঐ জিনিস যার মাধ্যমে কোন একটি শ্রেনী আধিপত্য অর্জন করে এবং নিজের বিশেষায়িত অবস্থান (privileged status) বজায় রাখে। গ্র্যামশির মতে, বুর্যোয়াদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রনকে রক্ষা করে এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য।

আধুনিক বিশ্বে নিয়ন্ত্রন শুধু সামরিক না। বরং জনগণকে নিয়ন্ত্রনের অন্যতন প্রধান হাতিয়ার হল মিডিয়া। সমাজের সংস্কৃতির প্যারামিটার এবং সীমানাগুলো ঠিক করে দেয়ার মাধ্যমে মিডিয়া নিপুণভাবে জনগণের চিন্তা, চেতনা ও আবেগকে নিয়ন্ত্রন করে। নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে হিসেবে সামরিক শক্তির চেয়েও মিডিয়া বেশি কার্যকরী।

কিন্তু কালচার আসলে কী?

কিছু নিয়ম, রীতিনীতি, প্রথাপ্রচলন, কিছু ট্যাবু, কিছু মূল্যবোধ, কিছু মোটিফের সমষ্টিই তো, তাই না? তো এই রীতিনীতি, প্রথাপ্রচলন, ট্যাবু,মোটিফগুলো–এই কালচার–কে তৈরি করলো?

গ্র্যামশির মতে, কেউ যদি সমাজের ন্যারেটিভ নিয়ন্ত্রন করতে পারে, এবং কেউ যদি জনগণকে বোঝাতে পারে–

> যেসব সাংস্কৃতিক রীতিনীতি (norms) আমাদের সমাজে আছে, সেটাই পৃথিবীর চিরন্তন রীতি, সবকিছু এভাবেই সবসময় ছিল অথবা এভাবেই সবসময় থাকার কথা–তাহলে মানুষ স্ট্যাটাস কৌ বা বিদ্যমান অবস্থা নিয়ে আপত্তি করবে না।

সাইক্লোনের কথা চিন্তা করুন। সাইক্লোন মানুষের জানমাল ধ্বংস করে। অনেক মানুষ আর কমিউনিটির জীবনে অবর্ননীয় দুর্ভোগ নিয়ে আসে। ক্ষতি হয় লক্ষ লক্ষ কিংবা কোটি কোটি টাকার। কিন্তু মানুষ কখনো সাইক্লোনের ওপর রাগ করে না। কারণ সাইক্লোনের ধ্বংসযজ্ঞের পেছনে কোন বিদ্বেষ নেই। ক্ষতির কোন ইচ্ছা নেই। সাইক্লোনের জন্য কাউকে দায়ী করা যায় না, দোষী করা যায় না। এবং সাইক্লোনকে থামানো যায় না। এটাই জীবন। এটাই বাস্তবতা। একে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

কিন্তু সাইক্লোনের ক্ষেত্রে যেটা সত্য সমাজের প্রভাবশালী সংস্কৃতির জন্য তা সত্য না। সাইক্লোন এক অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা যা মানুষের নিয়ন্ত্রনের বাইরে। কিন্তু সংস্কৃতি মানুষ তৈরি করা। সমাজের প্রভাবশালী শ্রেনী লোকেরা নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করা এবং টিকিয়ে রাখার জন্য সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রন করে। আর তাদের তৈরি করা এই সংস্কৃতির কল্যাণে সমাজের অন্য মানুষরা মনে করে–

> *সমাজের যুলুম, শোষণগুলো আসলে সাইক্লোনের মতোই জীবনের আরেকটা অমোঘ বাস্তবতা। এগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করা, এগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অর্থহীন। এগুলো মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই।*

কিন্তু আসলে এটা বাস্তবতার চিরন্তন কোন অংশ না, অবধারিত, অমোঘ কিছু না। বরং এটা কালচারাল হেজেমনি বা সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মাধ্যমে তৈরি মায়া। বিভ্রম।

আর একারণেই মার্ক্সের সেই বিপ্লব আসছে না। সর্বহারা এখনো শেকলে আটকে আছে, কারণ শেকল ভাঙ্গার বদলে তারা ঐ শেকলকে দুনিয়ার চিরন্তন বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিয়েছে। এটাই কালচারাল হেজেমনির শক্তি। কালচার একসময় মানুষের 'কমনসেন্স' হয়ে যায়। এবং এই 'কমন সেন্স' তখন সমাজের ওপর প্রভাবশালী শ্রেনীর নিয়ন্ত্রন আর আধিপত্যকে বৈধতা দেয়। জনগণকে বলে–

> *আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অনেক কিছু হয়তো তোমার ভালো লাগছে না। কিন্তু এটাই বাস্তবতা, এটা মেনে নিতে হবে...*

আর এভাবে সর্বহারা অমোঘ মনে করে ঐ কাঠামোর ভেতরে, ঐ কাঠামোর নিয়ম মেনে অংশ নেয়। আর আধিপত্যের কাঠামোর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সর্বহারা বিদ্যমান বাস্তবতা ও ব্যবস্থাকে বৈধতা দিয়ে দেয়। শক্তিশালী করে।

সামরিক আধিপত্যের মতোই সাংস্কৃতিক আধিপত্যের উদ্দেশ্য ক্ষমতায় টিকে থাকা। আর ক্ষমতায় টিকে থাকার সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হল, মানুষের মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রন করা। এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বুদ্ধিজীবিরা। তাদের কথা, আলোচনা, ইত্যাদি মানুষের মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে। তাদের লেখাগুলোই পত্রিকায় ছাপা হয়। তারাই টকশোতে গিয়ে নানা ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ আওড়ায়। এদের গবেষণাগুলোই জার্নালে প্রকাশিত হয়, এরাই পাঠ্যবই লিখে, পাঠ্যসুচী ঠিক করে। পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তার ছক ঠিক করে দেয় এরাই। আর এরা এই অবস্থান আসার সুযোগ পায়–এদেরকে এই অবস্থানে আসতে এবং থাকতে দেয়া হয়–কারণ তারা বিদ্যমানতাকে বৈধতা দেয়।

এই কালচারাল হেজেমনি যে সবসময় কোন সংগঠিত গোষ্ঠীর মাধ্যমে তৈরি হয়, তা না। অনেক সময় কেবল ব্যক্তিস্বার্থ থেকে মানুষ বিদ্যমান ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে। বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরোধিতা করতে গেলে ক্ষতিগ্রস্থ হবার ব্যাপক আশঙ্কা থাকে। সেই

ঝুঁকি না নিয়ে ব্যক্তিস্বার্থের জায়গা থেকে অনেক মানুষ চিন্তা করে, কীভাবে বর্তমান ব্যবস্থা থেকে সে লাভবান হতে পারে। আর এভাবে সে বিরাজমান সিস্টেমের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়, এবং সিস্টেমকে সমর্থন করে। এবং অধিকাংশ মধ্যবিত্তকে এভাবেই চিন্তা করতে শেখানো হয়।

গ্র্যামশির কালচারাল হেজেমনি তত্ত্বের আলোচনা ব্যাপক। এটা খুব সরলীকৃত উপস্থাপন। এই তত্ত্বের অনেক দিকের সাথে আমরা একমত না। এর বিস্তারিত খুঁটিনাটি, অ্যাকাডেমিক বিশ্লেষণ আমাদের জন্য জরুরীও না। তবে সমাজ ও রাষ্ট্রে ক্ষমতার কাঠামোকে বোঝার ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব আমাদের কাজে লাগতে পারে।

যেমন, এই পুরো আলোচনা থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটি উপসংহার খুঁজে পেতে পারি।

বাংলাদেশে মুসলিমদের সামনে অন্যতম প্রধান সমস্যা হল সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর কালচারাল হেজেমনি বা সাংস্কৃতিক আধিপত্য। আর বাংলাদেশে তাদের এই আধিপত্যের মূল স্তম্ভগুলো হল হল– শিক্ষা, মিডিয়া, আইন এবং ‘অনুমোদিত ইসলাম’ (অর্থাৎ সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠী যতোটুকু ইসলামকে বৈধতা দেয় ততোটুকু পালন)।

শহুরে এলিটদের চেয়ে মাদ্রাসার “হুজুররা” কিংবা সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহনের পরও দ্বীন পালন সচেষ্ট 'প্র্যাকটিসিং মুসলিমরা' অনেক দিক অধিক জনসম্পৃক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও হলেও তাদের জীবন, তাদের ওপর যুলুম হত্যা গুরুত্ব পায় না। এর কারন হল সেক্যুলার-প্রগতিশীলদের এই সামাজিক আধিপত্য।

শিবির আর কোটা আন্দোলন, দুটোর ওপরই হামলা হয়, কিন্তু ‘সমাজের’ প্রতিক্রিয়া হয় ভিন্ন। 'তাণ্ডব’ আর ‘ক্র্যাকডাউন’ -এর ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া হয় ভিন্ন। টিপ আর হিজাবের “অধিকার”, দুটো নিয়েই তর্ক হয়। কিন্তু প্রতিক্রিয়া হয় ভিন্ন।

দুই ক্ষেত্রে দুই বয়ান। দুই নিয়ম।

কাজেই বাংলার মুসলিমদের বর্তমান দুর্বল, অসহায় ও আক্রান্ত অবস্থাকে বদলাতে হলে সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সামাজিক আধিপত্যকে আগে ভাঙ্গতে হবে। আর তার প্রথম ধাপ হল তাদের তৈরি করা বাঙ্গালিত্ব, বাঙ্গালিয়ানা এবং বাঙ্গালি সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বয়ান পুরোপুরিভাবে বর্জন করা।

'কালচার ওয়ার' (সাংস্কৃতিক যুদ্ধ) শব্দগুলো এসেছে জার্মান Kulturkampf (কুলট্যুরকাম্ফ) থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ক্যাথলিক চার্চের সাথে প্রুশিয়ার সেই সময়কার শাসক অটো ভন বিসমার্কের দ্বন্দ্ব বেশ তীব্র হয়ে দাঁড়ায়। এই দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ ছিল ক্যাথলিক চার্চের শিক্ষাব্যবস্থা এবং স্বায়ত্তশাসনের ওপর সেক্যুলার সরকারের হস্তক্ষেপ।

তবে Kulturkampf বলতে এখন আর কেউ উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ঝাপসা হয়ে আসা কোন অধ্যায়কে বোঝায় না। কালচার ওয়ার বা সাংস্কৃতিক যুদ্ধের অর্থ আজ বদলে গেছে। কোন মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং আচরণগুলো সমাজে কর্তৃত্ব করবে তা নির্ধারনের জন্য যে আদর্শিক যুদ্ধ, সেটাকেই এখন কালচার ওয়ার বা সাংস্কৃতিক যুদ্ধ বলা হয়।

এ যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলো লড়াই করে সমাজে নিজ নিজ বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচরণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। এই লড়াইয়ের উদ্দেশ্য ঐ সমাজের আত্মপরিচয়কে সংজ্ঞায়িত করা। এই লড়াইয়ের ফলাফল ঠিক করে দেয় ঐ সমাজের ভবিষ্যৎ কেমন হবে। এই যুদ্ধের সংঘর্ষগুলো হয় ঐ ধরণের বিষয়ে যেগুলো নিয়ে সমাজে আছে তীব্র মতপার্থক্য। যেগুলোকে কেন্দ্র করে সমাজে মেরুকরণ ঘটে।

সাম্প্রতিক সময়ে সাংস্কৃতিক যুদ্ধের সবচেয়ে চোখে পড়ার মত উদাহরণ অ্যামেরিকা। বেশ কয়েক দশক বছর ধরে অ্যামেরিকায় দুটো পরিচয়ের সংঘাত চলছে। একদিকে রক্ষণশীল অ্যামেরিকা যারা খ্রিষ্টান এবং কিছুটা বর্ণবাদী। অন্যদিকে প্রগতিশীল অ্যামেরিকা, যারা পুরোপুরিভাবে লিবারেল-সেক্যুলার মূল্যবোধ ধারণ করে। এক দিকে অ্যামেরিকার প্রাণকেন্দ্রের মধ্যবিত্ত সাদারা, অন্যদিকে উপকূলীয় অঞ্চলের এলিটরা।

এই দুই অ্যামেরিকা নিজ নিজ মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং আচরণের আধিপত্যের জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। আর এই লড়াই হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক ও 'কালচারাল' ইস্যুকে কেন্দ্র করে। যেমন– গর্ভপাত, সমকামীতা, ট্র্যান্সজেন্ডার (লিঙ্গ পরিবর্তন), পাঠ্যসূচী, পর্নোগ্রাফি, বহুত্ববাদ, ইমিগ্রেইশান, বর্ণপরিচয়, লাইফস্টাইল ইত্যাদি।

এই ধরনের ইস্যুগুলো নিয়ে তর্কগুলোকে সাধারনত বিছিন্ন ইস্যু হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু এই ইস্যুগুলো আসলে একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই ইস্যুগুলো নিয়ে মানুষের তর্ক আর মতপার্থক্য অল্প কিছু যুক্তি আর পাল্টাযুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না। বরং এখানে সংঘাতটা আসলে দুই ধরনের ওয়ার্ল্ডভিউ (worldview), দুই ধরনের জীবনপদ্ধতির মধ্যে। কাজেই এই ধরনের প্রতিটা ইস্যুতে চলা সামাজিক তর্কগুলো আসলে একটা লম্বা যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত ছোট ছোট লড়াই।

স্বাভাবিকভাবে মনে করা হয় সাংস্কৃতিক যুদ্ধে মার্কিন ডানপন্থীরা পরাজিত হয়েছে। লিবারেল-বাম মূল্যবোধগুলোই এখন অ্যামেরিকার আইন, মিডিয়া এবং শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মাত্র ৬০-৭০ বছরের মধ্যে গভীরভাবে ক্রিশ্চিয়ান সমাজ থেকে অ্যামেরিকা আজ এসে পড়েছে সমকামীতা আর ট্র্যান্সজেন্ডার উন্মাদনার কবলে। কাজেই ডানপন্থীর পরাজয় নিয়ে খুব একটা সন্দেহের সুযোগ পাওয়া যায় না।

তবে আমার মতে অ্যামেরিকার ডানপন্থীদের কিছু সফলতাও আছে। সাংস্কৃতিক যুদ্ধের অন্যতম প্রধান দুটি উদ্দেশ্য হল –

ক) সমাজে বিভাজন এবং মেরুকরণ বাড়ানো

খ) 'কালচার' বা 'সভ্যতাগত পরিচয়'-কে রাজনীতির মূল প্রশ্ন ও মূল কেন্দ্র বানানো

সাধারণত কোন দেশ বা সমাজের ভেতর মূল রাজনৈতিক বিভাজন বা দ্বন্দ্ব তৈরি হয় শ্রেণী, বর্ণ, অর্থনীতি, ভৌগলিক পার্থক্য কিংবা বিভিন্ন সেক্যুলার মতবাদের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। Kulturkampf-এর উদ্দেশ্য ব্যাপক সামাজিক মেরুকরণের মাধ্যমে

‘সভ্যতাগত পরিচয়’কে সমাজের প্রধান রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে পরিণত করা। যেখানে রাজনীতির মূল কেন্দ্র হবে বিশ্বাস, জীবনযাত্রা, মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা নিয়ে মতপার্থক্য।

একদম সহজে বললে, সাংস্কৃতিক যুদ্ধের উদ্দেশ্য আকীদাহর ভিত্তিতে সমাজ ও রাজনীতিতে বিভাজন তৈরি করা। রাজনীতির আলোচনাকে অমুক দল বনাম তমুক দল থেকে সরিয়ে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্বে পরিনত করা। সফলভাবে চালানো সাংস্কৃতিক যুদ্ধ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যেকার পলিসিগত পার্থক্যগুলোকে অপ্রাসঙ্গিক বানিয়ে দেয়। তার বদলে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হয়ে দাড়ায়,

কার আকীদাহ কোনটা?

সমাজে বিভাজন এবং মেরুকরণ বাড়ানো এবং ‘কালচার’ বা ‘সভ্যতাগত পরিচয়’-কে রাজনীতির মূল প্রশ্ন ও মূল কেন্দ্র বানানো—এ দুই দিক থেকেই মার্কিন ডানপন্থীদের সফলতা উপেক্ষা করা যায় না। উগ্র সেক্যুলার গ্লোবালিসমের দিকে ঝোঁকার ব্যাপারটা পুরো পশ্চিমা বিশ্বেই ঘটেছে। কিন্তু ইউরোপের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা যে মাত্রায় হয়েছে, অ্যামেরিকাতে সেভাবে হয়নি। অ্যামেরিকাতে এখনো শক্তিশালী ডান রাজনীতি আছে। টি-পার্টি (Tea Party), মিলিশিয়া মুভমেন্ট (Militia Movement), অল্ট-রাইট আছে[১]। আছে ট্রাম্পের মতো নেতা। অ্যামেরিকার অর্ধেকের কাছাকাছি জনগোষ্ঠীর মধ্যে তীব্রভাবে বাকি অর্ধেকের জন্য ঘৃণা আছে। সাংস্কৃতিক যুদ্ধে জিততে না পারলেও, মেরুকরণ এবং কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক বিভাজন তৈরিতে মার্কিন ডানপন্থীরা সফল। এটুকু তাই বলাই যায়।

সাংস্কৃতিক যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনা বাংলাদেশের মুসলিমদের প্রাসঙ্গিক কেন?

কারণ এই ধরনের আদর্শিক দ্বন্দ্বের বেশ কিছু কৌশলগত সুবিধা আছে।

সম্পদ, অবকাঠামো, দক্ষ জনবল, নেটওয়ার্কিংসহ বিভিন্ন দিক থেকে বাংলাদেশের সেক্যুলার-প্রগিতিশীল শ্রেনী এবং মুসলিমদের ক্ষমতা ও সামর্থ্যের মধ্যে আছে চরম ভারসাম্যহীনতা। সাংস্কৃতিক যুদ্ধ থেকে পাওয়া সুবিধা এই ভারসাম্যহীনতাকে কিছুটা হলেও কমিয়ে আনে। যেমন—

১। বর্তমান বাস্তবতায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছোটখাটো কথা বলাও অনেকের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। কিন্তু সামাজিক ইস্যুতে অনেক শক্ত কথাও তুলনামূলক সহজে বলে ফেলা যায়। এই ধরনের বিষয়ে এখনো ঐভাবে কথা নিয়ন্ত্রন করা যায় না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কথা ও কাজের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুযোগ আছে।

২। গত দু-তিন বছরের বিভিন্ন ঘটনা থেকে বোঝা যায় অনলাইন অ্যাক্টিভিসম-এর একটা প্রভাব অফলাইনে আছে। সম্প্রীতি বাংলাদেশ, ১০ মিনিট স্কুল, সাকিবের কালী পূজা, আড়ং, পহেল বৈশাখের আয়োজন ফ্লপ করা, নবী (ﷺ) অবমাননার বিরুদ্ধে কলেজ-ইউনিভার্সিটির সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত মিছিলসহ বেশ কিছু উদাহরণ আমাদের সামনে আছে। অনলাইন প্রচারণার কারণে অত্যন্ত জনপ্রিয় বেশ কিছু সেক্যুলার কালচারাল আইকনকে এসব ঘটনায় নিজেদের অবস্থান থেকে পিছু হটতে হয়েছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুসলিমদের সেন্টিমেন্ট আমলে নিয়ে প্রচ্ছন্ন বা পরোক্ষভাবে দুঃখপ্রকাশ করতে হয়েছে। পহেলা বৈশাখের মত রাষ্ট্রযন্ত্র সমর্থিত সাংস্কৃতিক ঈদ-ও ব্যর্থ হয়েছে।

[১] উগ্র ডানপন্থী এবং নব্যনাৎসি বিভিন্ন গোষ্ঠী

লক্ষনীয় বিষয় হল, এর জন্য স্বতন্ত্র মিডিয়া কোম্পানি, পত্রিকা, টিভিচ্যানেল তৈরি করতে হয়নি। বিশাল সামাজিক প্রতিষ্ঠান, কিংবা অনেক টাকাপয়সা লাগেনি। কাজগুলো হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মত 'লো-টেক', 'সাশ্রয়ী' পদ্ধতি ব্যবহার করেই।

তার ওপর এই কাজগুলো নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা নিয়ে হয়নি। সবাই নিজের মতো এলেমেলোভাবে করেছে। একই কাজ যদি একটু পরিকল্পনা করে, অল্প কিছু পুঁজি খাটিয়ে, সমন্বয় করে করা যায় তাহলে এর প্রভাব কেমন হতে পারে ভাবুন তো?

৩। বিভিন্ন ভাইরাল সামাজিক ইস্যু/ইভেন্ট; বিশেষ করে যেসব ইস্যুতে ইসলামী এবং সেক্যুলার মূল্যবোধের সংঘাত থাকে–সেগুলো সামাজিক মেরুকরণের এঞ্জিনের মত কাজ করে। অর্থাৎ এই ইস্যুগুলো নিয়ে তীব্র তর্ক-বিতর্ক সমাজের অনেকের চিন্তায় পরিবর্তন আনে। বিশেষ করে যারা আদর্শিক ভাবে সেক্যুলার না, আবার 'প্র্যাকটিসিং মুসলিম'ও বলা চলে না – এই ধরনের মধ্যবর্তী মানুষের মধ্যে এসব তর্কের ফলে পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা বেশি থাকে। যে মানুষ এর আগে কখনো এসব বিষয় নিয়ে ভাবেনি, সেও কিছুটা চিন্তা করতে বাধ্য হয়। সেক্যুলার-প্রগতিশীলদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের কারণে যে সত্যগুলো মানুষ ভুলে ছিল সেগুলো আবার সে মনে করতে শুরু করে।

৪। পরিকল্পিতভাবে চালানো সাংস্কৃতিক যুদ্ধের ফলে ধীরে ধীরে সমাজের প্রচলিত আলোচনা এবং বয়ানে পরিবর্তন আসে। কিছু কনসেপ্ট গ্রহণযোগ্যতা হারায়, কিছু নতুন কনসেপ্ট যুক্ত হয়। যে আলোচনাগুলোকে কালচাড়াল জমিদারর আগে অচ্ছুৎ বানিয়ে রেখেছিল, এই ধরনের মূহূর্তগুলোতে সেগুলোকে মাটি খুড়ে টেনে তুলে দাড় করিয়ে দেয়া যায় সবার সামনে। ধাক্কা দিয়ে বড় করে ফেলা যায় সমাজের গ্রহণযোগ্য আলোচনার সীমানাকে।

এখনও পর্যন্ত এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ শাহবাগ-শাপলা দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের ফলে সমাজে ব্যাপক মেরুকরণ সৃষ্টি হয়েছে। কিছুদিন আগে পহেলা বৈশাখের (২০২২) ফ্লপ হবার পেছনেও এই ধরনের মেরুকরণের ভূমিকা আছে।

সাংস্কৃতিক যুদ্ধের আলোচনা থেকে নিচের পয়েন্টগুলোকে তাই মূল শিক্ষা হিসেবে নেয়া যায় –

ক) ভাইরাল/বিতর্কিত সামাজিক ইস্যুকে যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজে মেরুকরণ বৃদ্ধি, এবং নিজের মতাদর্শের প্রসার ঘটানো সম্ভব।

খ) 'কালচার' বা 'সভ্যতাগত পরিচয়'-কে রাজনৈতিক বিভাজনের মূল কেন্দ্র বানানো সম্ভব।

গ) অনলাইন অ্যাক্টিভিসমের মাধ্যমে 'অল্প খরচে'/ফ্রী প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী প্রভাব তৈরি করা সম্ভব।

ঘ) এভাবে সমাজের গ্রহণযোগ্য আলোচনার সীমানাকে বড় করা সম্ভব। পরিবর্তন আনা সম্ভব মানুষের চিন্তার জগতেও।

ঙ) **রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কথা বলা ও কাজের সুযোগ বর্তমানে অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুযোগ আছে।**

(এরকম আরো বিভিন্ন কৌশলগত সুবিধা দেখানো সম্ভব। তবে আমাদের আলোচনার জন্য আপাতত এটুকু যথেষ্ট)

এসব কারণে সেক্যুলারদের আধিপত্যকে ভাঙ্গার জন্য যেকোন রাজনৈতিক কৌশলের চেয়েও 'কুলট্যুরকাম্ফ'/সাংস্কৃতিক যুদ্ধ—সভ্যতা ও আকীদাহগত পরিচয়ের ভিত্তিতে লড়াইয়ের এই পদ্ধতি তাই প্রাধান্য পাবার দাবি রাখে।

পর্ব ৭। মেটাপলিটিকস (**Metapolitics**)

মেটাপলিটিকস-এর ধারণার উৎপত্তি উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান চিন্তাবিদদের মধ্যে। প্রাথমিকভাবে মেটাপলিটিকস বলতে বোঝানো হতো অধিকার এবং রাজনীতির ব্যাপারে দার্শনিক অনুসন্ধানকে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জার্মানদের কাছ থেকে মেটাপলিটিকসের ধারণা গ্রহণ করে ফরাসী চিন্তাবিদরা। গ্রহণের পাশাপাশি ফরাসী কিছু সংযোজনও করে। তাদের সংজ্ঞায়নে মেটাপলিটিকস হয়ে দাড়ায় সামগ্রিকভাবে রাজনীতির ব্যাপারে দার্শনিক অনুসন্ধান।

মেটা-পলিটিকস অর্থ রাজনীতি করা না, বরং রাজনীতির ব্যাপারে চিন্তা করা। রাজনৈতিক অবস্থানের ধর্মীয়, এবং বিশ্বাসগত শেকড় অনুসন্ধান করা।

তবে সময়ের সাথে মেটাপলিটিকসের ধারণায় পরিবর্তন এসেছে বারবার। বিভিন্ন ঘরানার বুদ্ধিজীবি এবং রাজনৈতিক চিন্তকরা একে ব্যাখ্যা করেছে বিভিন্নভাবে। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক অ্যালেইন বাদিও যেমন ২০১২ সালে প্রকাশিত তার মেটাপলিটিকস নামের বইতে রাজনীতির মেটাপলিটিকাল আলোচনা উপস্থাপন করেন মার্ক্সিস্ট, লেনিনিস্ট এবং মাওয়িস্ট বৈপ্লবিক দর্শনের জায়গা থেকে।

তবে আমরা মেটাপলিটিকসের একটি নির্দিষ্ট ধারণার দিকে তাকাবো। এই ধারণা গড়ে করার পেছনে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ১৯৬০ এর দশকের ফরাসী কিছু ডানপন্থী চিন্তকের। নব্য ডানপন্থী এই ফরাসী চিন্তাবিদরা ইটালিয়ান নিও-মার্ক্সিস্ট অ্যান্টনিও গ্র্যামশির 'কালচারাল হেজেমনি'র ধারণা গ্রহণ করেন। গ্র্যামশির তত্ত্বের একটা অনুসিদ্ধান্তও তারা গ্রহণ করেন -

> *'রাজনৈতিক বিজয়ের পূর্বশর্ত আদর্শিক আধিপত্য (হেজেমনি) অর্জন'।*

এই তত্ত্ব ও অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তারা উপসংহার টানেন–

> *রাজনৈতিক বিপ্লবের শুরু হয় বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব থেকে। আর এই বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবের মূল ময়দান হল সংস্কৃতি। মানুষ কীভাবে চিন্তা করে, এটা যখন বদলে যায়, তখন অবধারিতভাবে সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে।*

মেটাপলিটিকস হল এই বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব আনার প্রচেষ্টা।

ফরাসী নব্য ডানপন্থীদের প্রধান তাত্ত্বিক ধরা হয় অ্যালেইন ডি বেনওয়াকে। ডি বেনওয়ার মতে–

> *'পৃথিবীর সব বড় বড় বিপ্লবগুলো আসলে কী করেছে? চিন্তার জগতে ইতিমধ্যে যে বিবর্তন হয়ে গেছে, বিপ্লবগুলো কেবল সেটাকে বাস্তবায়ন করেছে।'*

মেটাপলিটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বদলে প্রাধান্য দেয় সাংস্কৃতিক যুদ্ধকে। আর এখানেই গত শতাব্দীর প্রথম ভাগের ইউরোপীয় ডানপন্থী, রক্ষনশীল এবং অ্যামেরিকার নব্য-রক্ষণশীল ইত্যাদি ধারার সাথে 'নব্য ডানপন্থী'দের মূল পার্থক্য।

ডি বেনওয়াদের মতে, মেটাপলিটিকাল কর্মসূচী গতানুগতিক রাজনৈতিক কিংবা সশস্ত্র পন্থার মতো না। কারণ অর্থবহ রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে হলে আগে শিক্ষা, মিডিয়া এবং সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনতে হবে।

ফরাসী নব্য ডানপন্থীদের হাত ঘুরে আসা মেটাপলিটিকসের এই ধারণাকে নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশকে লুফে নেয় অ্যামেরিকার অলট-রাইট (Alt Right/Dissident right), এবং গত ১৫ বছরে ইউরোপে মাথাচাড়া দেয়া 'আইডেন্টিটারিয়ান'[২] আন্দোলনগুলো।

তাদের চোখে মেটাপলিটিকস হল ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন আনার চাবিকাঠি। মেটাপলিটিকাল যুদ্ধ এমন এক ময়দানে, এমন এক অক্ষে ঘটে, ব্যাপক মিডিয়া এবং রাষ্ট্রীয় সহায়তা সত্ত্বেও বামপন্থী এবং লিবারেলরা যেখানে দুর্বল।

অলট-রাইট এবং আইডেন্টিটারিয়ানদের উদ্দেশ্য হল মেটাপলিটিকসের মাধ্যমে ইউরোপ ও অ্যামেরিকার শ্বেতাঙ্গদের এক এক করে তাদের দলে নিয়ে আসা। তারা মনে করে পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থা বর্তমান অবক্ষয় এই মেটাপলিটিকাল পরিবর্তনকে আরো দ্রুত করে তুলবে।

অ্যামেরিকান অলট-রাইট এবং ইউরোপীয় আইডেন্টিটারিয়ানদের ভাষ্যমতে তাদের মেটাপলিটিকসের উদ্দেশ্য হল–

- কোন কোন রাজনৈতিক অবস্থান সঠিক,
- কোন কোন রাজনৈতিক লক্ষ্য কাঙ্ক্ষিত, এবং
- কোন কোন রাজনৈতিক ফলাফল অর্জন করা সম্ভব

–এ ব্যাপারে মানুষের চিন্তাকে বদলে দেয়া।

সহজ ভাষায়, সমাজের মানুষের চিন্তায় 'গ্রহণযোগ্য রাজনীতি'-এর যে ধারণা আছে, সেটাকে প্রশস্ত করা। মানুষের চিন্তার সীমানাকে নিজেদের আদর্শের দিকে টেনে আনা। মানুষের চিন্তার কাঠামো আর ওয়ার্ল্ডভিউ পালটে দেয়া। বিপ্লবের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে সাংস্কৃতিক অঙ্গন, বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গন এবং জনপরিসরকে প্রভাবিত করা।

তারা মনে করে-

> বর্তমান ব্যবস্থা যেহেতু টিকে আছে কালচারাল হেজেমনির মাধ্যমে, তাই সাংস্কৃতিক সংগ্রামের মাধ্যমে; মেটাপলিটিকাল স্ট্রাগলের মাধ্যমে, বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তনও সম্ভব।

মানুষের চিন্তার ধরণ পাল্টে দেয়ার এই কাজটা কোন নির্দিষ্ট দল বা সংগঠনের দ্বারা হওয়া জরুরী না। বরং বিভিন্ন দিক থেকে বিকেন্দ্রীকৃত ভাবেও কাজটা হতে পারে। তবে আলাদা আলাদা জায়গা থেকে কাজ করলেও পলিসি, স্ট্র্যাটিজি, মৌলিক বার্তার মতো কিছু ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য থাকবে। এবং সবার মৌলিক উদ্দেশ্য হবে এক:

- বিদ্যমান সামাজিক আধিপত্যকে (কালচারাল হেজেমনিকে) নষ্ট করা
- নিজেরা সামাজিক আধিপত্য অর্জন করা
- বিপ্লব

[২] ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী একটি আন্দোলন

মুসলিমদের দাওয়াহ এবং কর্মকাণ্ড কি শুধু “ধর্মীয়” বিষয়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে?

সেক্যুলারিসমে ধর্মের অবস্থান ব্যক্তিগত অঙ্গনে সীমাবদ্ধ। সমাজ, শাসন, অর্থনীতির মতো সামষ্টিক বিষয়গুলোকে ধর্মের আওতার বাইরে রাখা সেক্যুলারিসমের অন্যতম মৌলিক অবস্থান। সেক্যুলার চিন্তায় “ধর্মীয়” মানেই মাসজিদ, ঘর আর সীমিত কিছু আচারপ্রথার বিষয়।

কিন্তু এই কথাগুলো ইসলামের ক্ষেত্রে খাটে না। ইসলাম আমাদের শেখায় মানবজীবনের সব ক্ষেত্রকে ওয়াহীর নির্দেশনা অনুযায়ী চালাতে। আর এর মধ্যে অবধারিতভাবেই শাসন, অর্থব্যবস্থা আর সামাজিক কাঠামোর মত বিষয়গুলো চলে আসে।

ইসলাম তাত্ত্বিকতার ধর্ম না, প্রয়োগের ধর্ম। স্রেফ তাত্ত্বিকভাবে একে বোঝা যায় না। এই দ্বীনের সৌন্দর্যকে সত্যিকারভাবে বুঝতে হলে দ্বীন আকড়ে ধরে বাঁচতে হয়। আধুনিকতা থেকে বের হয়ে আসা অর্থনীতি কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত তাত্ত্বিক শাস্ত্র তাই ইসলামে পাওয়া যায় না। তত্ত্বকথা, কাল্পনিক মডেল আর বাদ-মতবাদের বিশাল বিমূর্ত অট্টালিকা ইসলাম তৈরি করে না। কিন্তু তার মানে এই না যে এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে আলোচনা বা নির্দেশনা ইসলামে নেই।

এই ক্ষেত্রগুলোর ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াহ আমাদের কিছু নির্দিষ্ট বিধান এবং সীমানা ঠিক করে দেয়। জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনগুলোর ব্যাপারে দেখিয়ে দেয় সমাধানের নানা পথ। ইসলাম আমাদের এমন কিছু মূলনীতি দেয় পরিবর্তনশীল বাস্তবতাকে আমলে নিয়ে যেগুলো বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করা সম্ভব।

কাজেই ধর্মের জন্য সেক্যুলারিসমের বানানো ছোট্ট খাঁচার ভেতর ইসলামকে ঢোকানো যায় না। ধর্মের জন্য সেক্যুলারিসমের বানানো সীমানা আর দ্বীন ইসলামের সীমানা এক না। সমাজ, শাসন, অর্থনীতির মতো বিষয়গুলো মুসলিমদের জন্য দ্বীনের বাইরের কোন আলোচনা না। মুসলিমদের দাওয়াহ এবং কাজের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এ বিষয়গুলো চলে আসবে।

আকীদাহ, মাসায়েল, তাযকিয়াতুননাফসের মত বিষয়গুলো যেমন ইসলামের অংশ। তেমনি সমাজ, শাসন, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি কিভাবে চলবে, এই আলোচনাগুলোও ইসলামের অংশ। আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলোর আলোচনা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব না।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে গতো আট-নয় দশক ধরে অধিকাংশ ইসলামী আন্দোলন আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলোর আলোচনার দিকে খুব একটা মনোযোগী হয়নি বা হতে পারেনি। এর পেছনে বিভিন্ন বাস্তবসম্মত কারণ আছে। আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াহর দেয়া সমাধানগুলো অবধারিতভাবে ইসলামী শাসনের সাথে সম্পৃক্ত। ইসলামী শাসনকে বাদ দিয়ে এই সমাধানগুলোর আলোচনা অনেকটা গাছ না লাগিয়ে ফল আশা করার মতো।

তাছাড়া আধুনিক জাতিরাষ্ট্র এমন এক বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে যা মৌলিকভাবে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যার ইসলামী সমাধানগুলোআধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা অনেক সময়ই তাই স্ববিরোধী হয়ে পড়ে। এই বিষয়ের ওপর ওয়ায়েল হাল্লাক্ব বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, সেগুলো দেখা যেতে পারে[৩]।

এসব কারণে ইসলামী আন্দোলনগুলো অল্প কিছু বিষয়ের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে নিয়েছে। মুসলিমদের দাওয়াতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ধীরে ধীরে কমেছে আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলোর উপস্থিতি। আজ দ্বীনি শিক্ষা, ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম

[৩] ইংরেজি – The Impossible State
আরবী - الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي (وائل ب.حلاق)

পালনের দাওয়াহ এবং সাদাকাহ-যাকাত সংক্রান্ত কিছু উদ্যোগের মধ্যেই আমাদের অধিকাংশ কাজ সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, একথা বললে ভুল বলা হবে না।

কারণ যাই হোক, সমাজের ওপর এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নেতিবাচক। এর ফলে মানুষের চিন্তার জগতে নিজে থেকেই এক ধরণের বিভাজন তৈরি হয়ে গেছে। মানুষ ধরেই নিয়েছে অর্থনীতি, সামাজিক সমস্যা, শাসন, যুলুমের মোকাবেলার মত বিষয়গুলোর সমাধানের পথ হল সেক্যুলার রাজনীতি। এগুলোর জন্য যেতে হবে সেক্যুলার রাজনীতির পথে। আর ইসলামী ব্যক্তিত্ব বা সংগঠনগুলোর কাছে মিলবে কেবল "ধর্মীয়" বিষয়ের সমাধান।

আমরা নিজেরাও অনেক সময় এই বিভাজনকে শক্তিশালী করি। সমাজে আলিমদের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে আমরা যেমন বলে ফেলি – *আলেমরা ছাড়া জানাযা পড়াবে কে?*

অথচ আলিমদের ভূমিকা কিছু ধর্মীয় আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। তাদের দায়িত্ব এবং সম্মান আরো অনেক বিস্তৃত। কিন্তু আমরা নিজেরাই এসব কথা বলে তাঁদেরকে অনেকটা আচারসর্বস্ব পুরোহিতের জায়গায় নামিয়ে আনি। ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োগকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা থেকে।

এই ধরণের চিন্তার অবধারিত ফলাফল হল সমাজ ও রাজনীতির নিয়ন্ত্রন সেক্যুলার শ্রেণীর হাতে চলে যাওয়া। গত আট-নয় দশকে উপমহাদেশে ঠিক তাই ঘটেছে। আর বিভিন্ন সেক্যুলার দল ও গোষ্ঠী তাদের আকীদাহ এবং এজেন্ডা অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রকে চালিয়ে নিয়ে গেছে। আর্থ-সামাজিক বিষয়ে ইসলামের জায়গা থেকে কথা বলার সুযোগও দিন দিন কমে এসেছে।

অথচ ব্যাপারটা সবসময় এমন ছিল না। ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী শাসন যখন ছিল, সেই সময়ের কথা নাহয় বাদই দিলাম, কলোনিয়াল দখলদারিত্বের সময়ও দ্বীনি ও দুনিয়াবি দু ধরণের ইস্যুকে ইসলামের ভিত্তিতে সমন্বয় করে আন্দোলনের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। আর্থ-সামাজিক যুলুমের বিরুদ্ধে দ্বীনের ভিত্তিতে একত্রিত হয়ে লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত আছে আল-জাযায়েরী, আল-খাত্তাবী, ইমাম শামিলসহ আরো অনেকের আন্দোলনের মাঝে। আমাদের হাতের কাছেই আছে শহীদ তিতুমীর এবং ফরায়েজী আন্দোলনের দৃষ্টান্ত।

ইমাম সাইয়্যিদ আহমাদ শহীদের আন্দোলনের সাথে যুক্ত তিতুমীরের ইসলামী আন্দোলন ছিল একটি সফল কৃষক আন্দোলনও। অন্যদিকে আরবের নাজদী আন্দোলন থেকে অনুপ্রাণিত হাজী শরীয়াতুল্লাহর তাজদীদি আন্দোলন শুরু হয়েছিল বাংলার জনগণকে শিরক ও বিদআহ থেকে মুক্ত করার জন্য। কিন্তু একসময় এই আন্দোলন মনোযোগী হয় আর্থ-সামাজিক নানা বিষয়ের দিকেও। দুদু মিয়ার স্লোগান, 'লাঙ্গল যার, জমি তার', স্পষ্টতই নীলকর এবং জমিদারদের যুলুমের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষক সমাজের মনোভাব মাথায় রেখেই তৈরি করা। আর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ সময়টাতেই ফরায়েজী আন্দোলন সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থায় পৌছে।

বাস্তবতা বলে "দ্বীনি-দুনিয়াবি" ইস্যুর এই বিভাজনকে টিকিয়ে রেখে ইসলামকে সামাজিক শক্তি হিসেবে দাড় করানো অত্যন্ত কঠিন। অধিকাংশ মানুষ আদর্শ বা আকীদাহ দ্বারা চালিত হয় না। ক্ষুধার্থ মানুষ, নয়টা-পাচটার রুটিনের যাতাকলে ক্লান্তশ্রান্ত মধ্যবিত্ত, চাইলেও কেবল আকীদাহর ওপর শক্ত অবস্থান নিতে পারে না।

এই মানুষগুলোকে কাছে টানতে হলে কথা বলতে হবে তাদের দুশ্চিন্তা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার জায়গাগুলো নিয়েও। বিপদের সময় তাদের পাশে দাড়াতে হবে। পাশাপাশি ইসলামকে উপস্থাপন করতে হবে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সমাধান হিসেবেও। যাতে অর্থনীতি, সমাজ, শাসনের নানা সমস্যার বাস্তব সমাধান হিসেবে ইসলামের কথা চিন্তা করার প্রবণতা সমাজের মধ্যে তৈরি হয়। এই অঙ্গন সেক্যুলারদের জন্য ছেড়ে দিয়ে রাখলে সমাজ ও শাসনের নিয়ন্ত্রন তাদের হাতেই থেকে যাবে।

ইসলামী দাওয়াহকে সত্যিকারভাবে সামাজিক শক্তিতে পরিণত করতে হলে ব্যক্তিগত অঙ্গন থেকে একে বের করে আনতে হবে। আর তা করার অন্যতম উপায় হল আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও সমস্যা নিয়ে ইসলামের অবস্থান থেকে আলোচনা নিয়ে আসা। শুধু বিদ্যমান ব্যবস্থার সমালোচনা করে সমাজের নেতৃত্ব অর্জন করা সম্ভব না।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে ফিরিঙ্গিরা খুব দক্ষভাবে ইসলামী শাসন এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেঙ্গে ফেলে সেখানে বসায় ইউরোপ থেকে আমদানী করা বিভিন্ন কাঠামো। ফিরিঙ্গিরা চলে যাবার পর থেকে তাদের বাদামী চামড়ার আদর্শিক সন্তানরা সেই ব্যবস্থাকেই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বে আজ যে রাষ্ট্রগুলো আছে, সেগুলো আসলে ভিন্ন নামে, ভিন্ন মুখোশে আর কিছুটা ভিন্ন পদ্ধতিতে সেই ঔপনিবেশিক শাসনেরই ধারাবাহিকতা।

অধিকাংশ মানুষ আজ তাই ইসলামকে দেখে বিমূর্ত আকীদাহ আর ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলের কিছু আচারআচরণের সমষ্টি হিসেবে। ইসলামকে সামাজিক শক্তিতে পরিণত করতে হলে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলাতে হবে।

যতোক্ষণ মানুষ ইসলামকে শুধু 'আসমানের ওপরের আর যমিনের নিচের' আলোচনা হিসেবে দেখবে ততোক্ষণ ইসলামী ব্যবস্থা অধিকাংশের কাছে একটা তাত্ত্বিকতা হিসেবেই থেকে যাবে। বাস্তব সমাধান হিসেবে ইসলামের কথা তারা চিন্তা করবে বা চিন্তা করতে পারবে না।

আর তার জন্য প্রয়োজন আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলোকে ইসলাম কিভাবে ব্যাখ্যা ও মোকাবেলা করতে শেখায় তা মানুষের সামনে তুলে ধরা। আমাদের মূল্যবোধ আর আদর্শ মানুষের মধ্যে অনুরণিত হবে যখন ইসলামকে আমরা তাদের সমাজ ও জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান হিসেবে দেখাতে পারবো।

আর এ কাজটা আমাদের জন্য নতুন হলেও খুব একটা কঠিন হবার কথা না। সামাজিক দিক থেকে চিন্তা করলে মডার্নিটির (আধুনিকতা) অসুখগুলোর তৈরি সমাধান ইসলামের মধ্যেই আছে।

আমাদের সমাজের প্রধান সমস্যাগুলোর কথা চিন্তা করুন।

মাদক, নারী নির্যাতন, ধর্ষন, যিনা, পরিবারের ভাঙ্গন, পর্নোগ্রাফি আসক্তি, যৌন বিকৃতি, পৌত্তলিক সংস্কৃতির আগ্রাসন, ডিপ্রেশন, আত্মহত্যা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, দুর্নীতি, অপরাধ...এধরনের অনেক সমস্যার সামগ্রিক সমাধান ইসলামী শিক্ষা ও বিধান থেকে পাওয়া যায়।

আধুনিক সাইকোলজিস্টের কাউন্সেলিং আর মনমগজ অবশ করে দেয়া ওষুধের চেয়ে তাসাউফ, তাযকিয়াতুননাফস, যুহুদ, এবং ক্বা'নার শিক্ষা অনেক বেশি ফুলফিলিং। ফ্রয়েড কিংবা কার্ল ইয়ুং এর চেয়ে মনের ডাক্তার হিসেবে অনেক বেশি স্বার্থক আল-গাযযালি, ইবনু জাওযী কিংবা ইবনুল কাইয়্যিমরা। আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারাক আর আহমাদ ইবনু হানবালদের শিক্ষার তুলনায় হাল আমলের ভাসাভাসা আধ্যাত্মিকতা ছেলেখেলার মতো।

কাঁচামালগুলো আমাদের হাতেই আছে, আমাদের শুধু সেগুলো উপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে হবে। পশ্চিমের অন্ধ অনুসরণের মনোভাব বাদ দিলে এটা অসাধ্য কিছু না।

অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রেও ইসলামের অবস্থান থেকে আলোচনা আনা সম্ভব। আর্থসামাজিক উন্নয়নে যাকাত, সাদাকাহ এবং করদ্বে হাসানের সম্ভাবনা পশ্চিমা অ্যাকাডেমিকরাও এখন স্বীকার করে। পশ্চিমা বিশ্বের ধনী দেশগুলো মিলে রাষ্ট্রীয়ভাবে মোট যতোটুকু মানবিক ত্রাণ (হিউম্যানেটেরিয়ান এইড) দেয়, মুসলিমদের দেয়া বাৎসরিক যাকাতের পরিমাণ তার চেয়ে কমপক্ষে পনেরো থেকে বিশ গুণ বেশি।

গ্রামীণ ব্যাংকের সুদ ভিত্তিক মাইক্রোফাইন্যান্স মডেলের চেয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে অনেক বেশি সফল পাকিস্তানের আখুওয়াতের করদ্বে হাসানাহ ভিত্তিক মাইক্রোফাইন্যান্স মডেল। পশ্চিমের এজেন্ডা পালন করে যাওয়া আগাছার মতো এনজিও-গুলোর চেয়ে সফলতা বেশি কওমী মাদ্রাসাগুলোর।

অন্যদিকে আধুনিক ফিনটেকের (fintech) বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে মুদারাবা এবং মুশারাকার মতো চুক্তি ব্যবহার করে ব্যাংকের সুদভিত্তিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে অতি-ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিকল্প অর্থায়নের আছে ব্যাপক সম্ভাবনা।

এছাড়া আইনী ব্যবস্থার আগে ইসলাম হল একটি নৈতিক ব্যবস্থা। ইসলাম শুধু আইন দেয় না, বরং এমন ব্যক্তি ও সমাজ তৈরি করে যারা গভীরভাবে কিছু নৈতিক শিক্ষার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামের এই নৈতিক শিক্ষাগুলো সুদ, ঘুষ, মজুতদারি, স্পেকুলেটিভ ট্রেইডিং (শেয়ারবাজারের ফটকাবাজি), প্রেডেটোরি লেন্ডিংসহ অনেক আধুনিক সমস্যার সমাধান দিতে পারে।

পরাজিত মানসিকতার মুসলিমরা সমাজ কল্যাণের মডেল হিসেবে এখন পশ্চিমের কল্যাণরাষ্ট্রের দিকে তাকায়। কিন্তু কল্যাণরাষ্ট্রের চেয়ে আরো কার্যকরী এবং টেকসই সমাধান আমরা পাই ইসলামী ওয়াকফ ব্যবস্থার মধ্যে। ইসলামী শাসনামলে অধিকাংশ মুসলিম ভূখন্ডের ৪০-৫০ শতাংশ ভূমি মালিকানা ছিল ওয়াকফের অধীনে। সমাজ ও অর্থনীতিতে আওকাফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির মিশেলে ওয়াকফের আর্থ-সামাজিক সম্ভাবনা অসীমের কাছাকাছি।

ওপরে বলা প্রতিটা বিষয়ের আলোচনা আরো বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এবং বর্তমান বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সীমিতভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব।

হ্যা, আমাদের কাজের সুযোগ সীমিত। এই সম্ভাব্য সমাধানগুলোর অনেকগুলোই, এমনকি অধিকাংশই হয়তো বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে বাস্তবায়ন সম্ভব না। কিন্তু এই বিকল্পগুলোর, আধুনিক সমস্যার এই সমাধানগুলোর আলোচনা উপস্থাপন করতে তো সমস্যা নেই। বরং এই ধরণের উপস্থাপনাই মানুষের মধ্যে ইসলামী ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষাকে আরো শক্তিশালী করে তুলবে।

ইসলামী শাসন কী জিনিস, ইসলামী শাসন কেমন ছিল, আধুনিক মানুষ তা জানে না। আমাদের কারো ইসলামী শাসন প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়নি। তবু ইমানের জায়গা থেকে, তাকওয়া এবং ভালোবাসার জায়গা থেকে আজো সাধারণ মুসলিমরা বলে তারা ইসলামী শাসন চায়। চিন্তা করুন, তাদের সামনের ইসলামী শাসনের বাস্তবতা, এর উৎকর্ষ ছিল, এবং কিভাবে ইসলামী শাসন আজো আমাদের জীবনকে সুন্দর করে তুলতে পারে তার কিছু উদাহরণ যদি তুলে ধরা যায় তাহলে তাদের মনে ইসলামী ব্যবস্থার প্রতি আকর্ষন কেমন হবে?

নিঃসন্দেহে জানার পর, এক ঝলক দেখার পর আকর্ষন আরো তীব্রতর হবে।

হ্যা, সেক্যুলারিসম, লিবারেলিসম, ফেমিনিসমসহ মডার্নিটির সৃষ্ট বিভিন্ন বাদমতবাদের খণ্ডন প্রয়োজন। নাস্তিকদের আদর্শিক মোকাবিলা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে সেক্যুলার-প্রগতিশীলদের সামাজিক আধিপত্যকে চিহ্নিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের আধিপত্যের এই কাঠামোকে নষ্ট করা আবশ্যক।

এ সবই সঠিক। কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট না। এগুলোর পাশাপাশি সমাধান হিসেবে ইসলামের আলোচনা আনাও প্রয়োজন। এবং সেটা শুধু ঢালাও কিছু বক্তব্য, মুখস্থ কিছু বুলি আউড়ে না। বরং অন্তত কিছু ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তারিত আলোচনা মানুষের সামনে উপস্থাপন করা জরুরী।

ধরুন, বাজারে তেলের দাম বেড়ে গেল। পত্রিকায় প্রতিবেদন আসলো সিন্ডিকেট করে দাম বাড়ানো হয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে জনপ্রিয় বক্তারা আলোচনা করে দেখাতে পারেন –ইসলামী শাসনের অধীনে কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা হতো। কিভাবে মুহতাসিব বা বাজার পরিদর্শকরা ইসলামী শাসনামলে নিয়মিত এসব বিষয়ে নজরদারি করতেন। ইসলামী শাসনের অধীনে সিন্ডিকেট করে দাম বাড়ানোর মতো অপরাধের শাস্তি কী হতো। এবং কিভাবে ইসলামী ব্যবস্থার তুলনায় আধুনিক সেক্যুলার, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এসব সমস্যার সমাধানে অক্ষম।

একইভাবে জনপ্রিয় লেখকরা এব্যাপারে আলোচনা করতে পারেন। এই ধরণের বিষয়ের ওপর ওয়েবিনার বা সেমিনারও হতে পারে।

লক্ষণীয় বিষয় হল, ইসলামের অবস্থানগুলো আদতে দেশে বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না, সেটা এখানে মুখ্য না। বর্তমান সেক্যুলার রাষ্ট্রে ইসলামের সমাধান বাস্তবায়নের আশা করা যায় না। এখানে মূল উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষের সামনে ধীরে ধীরে একটা বর্তমান ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে ইসলামী ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা। অমুক সরকারের বদলে তমুক সরকারের চিন্তা থেকে বের হয়ে মানুষের চিন্তাকে সেক্যুলার ব্যবস্থার বদলে ইসলামী ব্যবস্থার সমীকরনে নিয়ে আসা।

আরও একটা বিষয় মাথায় রাখা দরকার। সেক্যুলার-প্রগতিশীলদের সামাজিক আধিপত্য নষ্ট করে ইসলামকে সামাজিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজটা কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ। এই কাজের জন্য প্রয়োজন যোগ্য, আন্তরিক এবং আত্মত্যাগের মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ। শুধু খণ্ডন, সমালোচনা, ইত্যাদি দিয়ে সাধারণত এধরণের মানুষকে আকৃষ্ট করা যায় না।

মডার্নিটির সমালোচনা হোক। এই সমালোচনা দরকার, এই সমালোচনা অপরিহার্য। কিন্তু দিন শেষে বিকল্প হিসেবে একটা সলিড লক্ষ্য দাড় করাতে হবে। এমন কোন কোন গন্তব্য, এমন কোন ভিশনকে সামনে রাখতে হবে যার জন্য মানুষ নিজেকে উজাড় করে দিতে প্রস্তুত থাকবে।

জঙ্গল অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়তে শুরু করলে দাবানলের দরকার হয়। কিন্তু নতুন করে বীজ বোনা না হলে দাবানল শেষে ভস্মীভূত ধ্বংসস্তূপ আর কিছুই বাকি থাকে না। তাই ভাঙ্গার পাশাপাশি নতুন করে গড়ার গুরুত্বও আমাদের বুঝতে হবে।

আধুনিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের সাথে রাষ্ট্রযন্ত্রের সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হয়। রাষ্ট্রযন্ত্র আর ব্যক্তির মাঝে কোন মধ্যস্থতাকারী থাকে না। প্রথম দেখায় বিষয়টা ভালো মনে হলেও, বাস্তবে এই ধরণের সম্পর্ক তীব্র ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। চিন্তা করে দেখুন, রাষ্ট্র যদি যালিম হয়, অধিকার হরণকারী হয়, রাষ্ট্রযন্ত্র যদি কোন গোষ্ঠীর হাতিয়ারে পরিণত হয়—তখন ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে?

একদিকে অতিকায় রাষ্ট্রযন্ত্র, আরেকদিকে ক্ষুদ্র, দুর্বল, বিচ্ছিন একেক জন মানুষ। রাষ্ট্র ইচ্ছেমতো নাগরিকদের অধীনস্ত ও ধ্বংস করতে পারবে। এবং আধুনিক রাষ্ট্র ঠিক তাই করে।

কিন্তু ব্যাপারটা সবসময় এমন ছিল না। গোত্রীয় সমাজের কথা চিন্তা করুন। এমন সমাজে ব্যক্তির সাথে শাসকের সম্পর্কের মাঝখানে থাকে তার গোত্র। যখন সে মযলুম, গোত্র তাকে সহায়তা করে। তার পক্ষ হয়ে আলোচনা কিংবা দরকষাকষি করে। প্রয়োজনে আক্রমনের মুখে তাকে রক্ষা করে।

একাকী মানুষ দুর্বল, কিন্তু গোত্রের অংশ হিসেবে; একটা সামষ্টিক সত্ত্বার অংশ হিসেবে তার দুর্বলতা কমে। এই সামষ্টিক পরিচয় শুধু যে গোত্রের মাধ্যমেই তৈরি হতে হবে, তা কিন্তু না। ভাষা, সংস্কৃতি, আদর্শ, দ্বীন, স্বার্থ, শ্রেণী পরিচয়সহ বিভিন্ন কিছুর ভিত্তিতে এই সামস্টিক পরিচয় ও সংহতি গড়ে উঠতে পারে এবং উঠেছে।

কিন্তু আধুনিকতা চেষ্টা করে সব ধরনের সামষ্টিকতাকে মুছে দিতে। সব সামষ্টিক পরিচয় ও আদর্শকে সরিয়ে দিয়ে আধুনিক রাষ্ট্র সেখানে স্রেফ দুটো ধারণা বসাতে চায়– জাতীয়তাবাদ এবং নাগরিকত্ব। আর দুটি ধারণার ভিত্তিই হল রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য। কাজেই আধুনিকতার লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে বাকি সব সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে যুক্ত করা। কাগজে কলমে ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের এই সম্পর্ক পারস্পরিক চুক্তির। কিন্তু বাস্তবে এই সম্পর্ক অধীনস্ততা, নিয়ন্ত্রন আর জবরদস্তির।

মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডগুলোর ক্ষেত্রে এই বাস্তবতা আরো বেশি তীব্র। ঔপনিবেশিক আমলে মুসলিমদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দুর্বল করা হয়। তারপর সেগুলোকে সেক্যুলার প্রতিষ্ঠান দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয় অথবা অধীনস্ত করা হয় রাষ্ট্রযন্ত্রের। (বাংলার ফরায়েজী আন্দোলন এবং উপমহাদেশের কওমী মাদ্রাসা আন্দোলন–দুটোকেই এক অর্থে রাষ্ট্রের এই সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রনের বাইরে নিজস্ব কিছু জায়গা খোদাই করে নেয়ার চেষ্টা হিসেবে দেখা যায়।)

ইসলামের সামাজিক শক্তি ধ্বংস করা এবং ইসলামের ভিত্তিতে মুসলিমদের সংগঠিত হবার স্বাভাবিক প্রবণতাকে মুছে ফেলার এই প্রকল্প শুরু হয়ে ঔপনিবেশিক আমলে। ফিরিঙ্গিদের শুরু করা এই পরে কাজকে চালিয়ে নিয়ে যায় নব্য-উপনিবেশিক "স্বাধীন" রাষ্ট্রগুলো। তারা আজো তাই করে যাচ্ছে। ফলে তৈরি হয়েছে অ্যাটমাইযড (atomized) মানুষ—যারা সংখ্যায় অনেক, কিন্তু পরস্পর বিচ্ছিন্ন।

এই বিচ্ছিন্নতার অর্থ দুর্বলতা। আমরা পরস্পরবিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র কিছু মানুষ, রাষ্ট্র নামক অতিকায় দানবের মুখোমুখি। এমন মানুষের সামষ্টিক কোন শক্তি থাকে না, নিজস্ব কণ্ঠ থাকে না। তার চেয়ে বড় কথা, তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস থাকে না। নিজ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কিংবা স্বার্থ রক্ষার জন্যও সহজে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না তারা। এমন কোন উদ্যোগ নেয়ার সময় তার মধ্যে কাজ করে নানা সংশয়, দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর ভয়। বিচ্ছিন্ন মানুষ প্রতিরোধে অক্ষম। পরিবর্তনে অক্ষম।

এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার প্রথম ধাপ হল সংগঠিত হওয়া। বিচ্ছিন্ন মানুষ নিজে নিজে কার্যকরভাবে যুলুম এবং বৈষ্যমের মোকাবেলা করতে পারে না। এর জন্য কাজ করতে হয় সমষ্টিগতভাবে। আধুনিক যুগে সত্যিকারের দাবি আদায়ের কিংবা বড় ধরণের পরিবর্তনের যতো উদাহরণ আছে তার সবই অর্জিত হয়েছে কোন না কোন ধরণের সামষ্টিক কর্মসূচীর মাধ্যমে।

শ্রমিক ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, গেরিলা যুদ্ধের কথা বলুন, কিংবা বিপরীত প্রান্তের লবি, প্রেশার গ্রুপ, সংখ্যালঘুদের অধিকার আন্দোলন বলুন—সবই কোন না কোন ধরণের সামষ্টিক, সংগঠিত প্রচেষ্টার ফল।

বাংলাদেশের মুসলিমের বর্তমানের দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে হলে তাই বাস্তব দুনিয়াতে (অনলাইনে না) একত্রিত হতে হবে। বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোকে পরিণত করতে হবে সমষ্টিতে।

- কোন মেইনস্ট্রিম রাজনৈতিক দল আমাদের সাহায্য করতে আসবে না। সাময়িকভাবে আমাদের কাছে টানলেও দিন শেষে তারা সাংস্কৃতিক জমিদার মন রেখে চলারই চেষ্টা করবে।
- বাহ্যিক শক্তি আমাদের সাহায্য করবে না। বরং আশেপাশের শক্তিরা আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করবে।
- সংবিধান, জাতীয়তা, ইতিহাস কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোহাই দিয়েও লাভ হবে না। কারণ এই শব্দগুলোর সংজ্ঞা ঠিক করে সেক্যুলার-কালচাড়াল জমিদাররাই। তারাই এগুলোর "সঠিক ব্যাখ্যা" ঠিক করে।

কাজেই পরিবর্তন চাইলে আমাদের নিজেদের সংগঠিত হয়ে কাজ করতে হবে। এই সিরিযের শুরু থেকে আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি—সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সামাজিক আধিপত্য ভাঙ্গা, সাংস্কৃতিক যুদ্ধ, আর্থসামাজিক সমস্যার আলোচনায় ইসলামকে উপস্থাপন করা, সর্বোপরি ইসলাম সামাজিক শক্তি হিসেবে হাজির করা—এই সব কিছু অর্জনের জন্য বাস্তব দুনিয়াতে কাজ করা আবশ্যক।

আজকের এই ইসলামবিদ্বেষ, বৈষম্য, অপমান আর অবমাননা বন্ধ করতে চাইলে—নিজের জন্মভূমিতে দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিক হয়ে থাকার বাস্তবতাকে বদলাতে হলে–নিজেদেরকেই উদ্যোগ নিতে হবে। গ্রহণ করতে হবে দীর্ঘমেয়াদী স্ট্র্যাটিজি। আর তা বাস্তবায়ন করতে হবে সবর, ফিরাসাহ আর হিকমাহর সাথে।

এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। বাস্তব দুনিয়াতে সংগঠিত হওয়া বলতে এখানে রাজনৈতিক সংগঠন বা এ জাতীয় কিছু তৈরি, কিংবা "গণতান্ত্রিক ইসলামী" দলের সাথে যুক্ত হবার কথা বলা হচ্ছে না। মিছিল, মানববন্ধন বা এধরণের উদ্যোগের কথাও বোঝানো হচ্ছে না।

মিছিল, মানববন্ধনের মতো বিভিন্ন কর্মসূচী অবশ্যই গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু এটা মূল কাজের একটা ছোট অংশ কেবল। এই ধরণের কর্মসূচীগুলো সাধারণত ইস্যুভিত্তিক হয়। অর্থাৎ এই কর্মসূচীগুলো সাময়িক, এবং এগুলো মূল উদ্দেশ্যে পৌছানোর জন্য ব্যবহৃত কিছু মাধ্যম। মাধ্যমকে যেন আমরা উদ্দেশ্য মনে না করি।

কোন নির্দিষ্ট ইস্যুতে কোন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মিছিল করা যেতে পারে। কিন্তু মিছিল করাই যেন মূল উদ্দেশ্যে পরিণত না হয়। এই পার্থক্য বোঝা জরুরী। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনের দীর্ঘমেয়াদী কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা না থাকলে কেবল মিছিল, অবরোধ কিংবা লংমার্চ দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন আসবে না। তাতে লোক সমাগম যতো বেশিই হোক না কেন।

সমাজের ওপর সেক্যুলার জমিদারদের আধিপত্য ভাঙ্গা এবং ইসলামকে সামাজিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাস্তব দুনিয়াতে কাজ করতে গেলে প্রথমে মুসলিমদের মধ্যে আত্মপরিচয় ও আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি জোরালো করতে হবে। তারপর সামাজিকভাবে সংঘবদ্ধ হতে হবে। যাতে মুসলিমরা; বিশেষ করে তরুণরা এমন কিছু প্ল্যাটফর্ম পায় যেখানে তারা একত্রিত

হতে পারবে। যেখানে বিচ্ছিন্নতা থেকে বের হয়ে তারা সমষ্টির মাঝে শক্তি খুঁজে পাবে। এমন কিছু মঞ্চ তাদের জন্য তৈরি করতে হবে যেগুলোর মাধ্যমে সমাজের সামনে তারা নিজের কথা এবং চিন্তাগুলো তুলে ধরতে পারবে।

সেটার শুরু হতে পারে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে "ইসলামী ইতিহাস" কিংবা "ইসলামী সভ্যতা ও চিন্তা" কেন্দ্রিক ক্লাব গড়ে তোলার মাধ্যমে।

হতে পারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে "ইসলামবিদ্বেষের ব্যাপারে সচেতনতা" সৃষ্টির জন্য সংস্থা তৈরি করে।

কিংবা হতে পারে আর্থসামাজিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ইসলামের অবস্থান বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য সমাধান উপস্থাপনের জন্য গবেষণা সংস্থা তৈরি করে।

কাজ করা যেতে পারে সামাজিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে – পর্নোগ্রাফি, যিনা, মাদক, ডিপ্রেশন, সুইসাইড, পরিবারের ভাঙ্গন, স্ক্রিন আসক্তি, ক্যারিয়ার অ্যাডভাইস – কাজ করার মতো ইস্যু অনেক। কাজ হতে পারে দাওয়াতী এবং ইসলাহী প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেও।

ধরণ যাই হোক মূল আলোচনা ইসলাম এবং মুসলিম পরিচয়ের বিষয়টা থাকতে হবে স্পষ্টভাবে । ইসলামকে মূল ভিত্তি এবং দিকনির্দেশনা হিসেবে নেয়ার ব্যাপারটা থাকবে দাওয়াহর কেন্দ্রে। এখানে লুকোচুরি করা যাবে না।

একই সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে আলোচনা বা বক্তব্য যেন নিরেট তাত্ত্বিক না হয়। মানুষ প্রভাবিত হবে যখন সে নিজের জীবনে ও সমাজে আপনার কথার প্রযোজ্যতা খুঁজে পাবে। বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন তাত্ত্বিক আলোচনা কিংবা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে আমলের তাগিদ এ ক্ষেত্রে অতোটা কার্যকরী হবে না। বরং মানুষকে দেখাতে হবে কিভাবে ইসলাম ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং শাসনের সমস্যারগুলোর সমাধান দেয়।

এই পথ দীর্ঘ ও বন্ধুর। এবং এর শুরুটা কঠিন, রাতারাতি বিশাল কিছু করে ফেলার, শর্টকাট নেয়ার, কিংবা অল্প সময়ে বড় রিটার্নের সুযোগ এখানে তেমন একটা নেই। কাজ শুরু করতে হবে প্রাথমিক পর্যায় থেকে। তবে সব মহীরুহের শুরুটা ছোট্ট বীজ থেকেই হয়।

***

সামাজিক শক্তি অনেক ধরনের সংজ্ঞা হয়। তার মধ্যে একটা দিয়ে শেষ করি। সংজ্ঞাটা একটু কাঠখোট্টা লাগবে, কিন্তু এটা আত্মস্থ করতে পারলে ইন শা আল্লাহ উপকার হবে।

> *সামাজিক শক্তি হল এমন সব ধরণের প্রভাব ও চাপপ্রয়োগের সক্ষমতার সমষ্টি যা (সমাজের) কোন এক গোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর ওপর প্রয়োগ করে। এই শক্তি প্রয়োগ করা হয় অন্যদের আচরণকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে, অথবা সামষ্টিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সেই গোষ্ঠীর নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে।* [Gene Sharp, How Non-Violent Struggle Works]

উপসংহার

আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছিল একটা প্রশ্ন দিয়ে।

> সমাজ ও রাষ্ট্রে ক্রমশ বাড়তে থাকা ইসলামবিদ্বেষ ও সেক্যুলারায়নের মোকাবিলা এবং বাংলার মুসলিমদের দ্বীন ও আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখতে হলে কী করণীয়?

এ প্রশ্নের জবাব আমরা দেয়ার চেষ্টা করেছি মোট ৫টি ধারণাকে ব্যবহার করে।

- সামাজিক আধিপত্য (Cultural Hegemony)
- সাংস্কৃতিক যুদ্ধ (Kulturekampf)
- আর্থ-সামাজিক
- **সামাজিক শক্তি অর্জন**
- মেটাপলিটিকস (Metapolitics)

সামাজিক আধিপত্য: বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিমদের দুর্বলতার মূল কারণ সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সামাজিক আধিপত্য। বাংলাদেশে তারা এমন এক সামাজিক কাঠামো তৈরি করেছে যা ইসলাম ও মুসলিমদের "অপর" এবং "শত্রু" হিসেবে দেখে, এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে পরিকল্পিতভাবে দূরে সরিয়ে রাখে। ইসলাম ও মুসলিমদের আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখতে হলে সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সামাজিক আধিপত্য ভাঙ্গা আবশ্যক। ইসলাম ও সেক্যুলারিসমের এই সংঘাতই বাংলাদেশের সমাজ ও শাসনের প্রধান দ্বন্দ্ব। অন্য সব কিছু গৌণ।

সাংস্কৃতিক যুদ্ধ: সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সামাজিক আধিপত্য ভাঙার পদ্ধতি হল বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে চালানো সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সমাজে যে বিভাজন প্রচ্ছন্নভাবে আছে তা স্পষ্ট করে তোলা, ইসলাম ও সেক্যুলারিসমের দ্বন্দ্বকে সমাজের মূল প্রশ্নে পরিণত করা, এবং এর ভিত্তিতে সমাজের মেরুকরণ।

আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও বাস্তবতার আলোচনা: প্রতিপক্ষের সামাজিক আধিপত্য ভাঙ্গা এবং সেক্যুলার ব্যবস্থার কার্যকরী বিকল্প হিসেবে ইসলামকে উপস্থাপন করতে হলে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও সমস্যা নিয়ে ইসলামের অবস্থান থেকে আলোচনা করতে হবে। স্রেফ ব্যক্তিগত জীবনে দ্বীন পালনের নাসীহাহ কিংবা সেক্যুলার ব্যবস্থার খণ্ডন বা সমালোচনা করে এটা হবে না।

> **সামাজিক শক্তি অর্জন:** সাংস্কৃতিক যুদ্ধ এবং ইসলামী বিকল্পের আলোচনা সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দিতে হলে বাস্তব দুনিয়াতে, তৃণমূলে কাজ করা আবশ্যক। তাই মুসলিমদের; **বিশেষ করে তরুণদের এমন কিছু প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে যেখানে তারা একত্রিত হবার সুযোগ পাবে। যেগুলোর মাধ্যমে সমাজের সামনে এই আলোচনাগুলো তারা তুলে ধরতে পারবে**।

মেটাপলিটিকস: এই সবগুলো উপাদান এক সাথে কাজ করবে সার্বিক মেটাপলিটিকাল ফ্রেইমওয়ার্ক বা পরিকল্পনার ভেতর। যার উদ্দেশ্য হল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশের চিন্তার ধরন আর ওয়ার্ল্ডভিউ পাল্টে দেয়া। কোন সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থান সঠিক, কোন লক্ষ্যগুলো কাঙ্ক্ষিত, এবং কোন ফলাফলগুলো অর্জন করা সম্ভব–এ ব্যাপারে মানুষের চিন্তাকে বদলে

দেয়া। যে কাঠামোর মধ্যে আজকের বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক হিসেবনিকেশ চলছে সেটাকে অপ্রাসঙ্গিক, তামাদি বানিয়ে ফেলা। একে এমন এক কাঠামো দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যার মূল ভিত্তি হবে ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়।

আমাদের বাস্তবতা, প্রেক্ষাপট, সীমাবদ্ধতা এবং সামর্থ্য বিবেচনায় বর্তমান পর্যায়ে এটি আমার মতে বাংলাদেশের মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে কার্যকর কর্মপদ্ধতি। এবং আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

***

সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সামাজিক আধিপত্য ভাঙ্গা, সামাজিক শক্তি অর্জন এবং সমাজের মানুষের চিন্তায় মেটাপলিটিকাল পরিবর্তন না আনলে যতোই ক্ষমতার পালাবদল হোক না কেন, বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিমদের অবস্থার উন্নতি হবে না। বরং সেক্যুলারাইযেইশান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দিন দিন সমাজে ইসলামের জায়গা আরও সঙ্কুচিত হয়ে আসবে। বাড়বে ইসলামবিদ্বেষ, অশ্লীলতা, অবক্ষয় এবং অবমাননা।

অন্যদিকে মুসলিমদের আবেগ বারবার শুধু সেক্যুলার রাজনীতির খেলায় ব্যবহৃত হতে থাকবে। নির্বাচনের সময় নেতানেত্রীদের হাতে তসবীহ উঠবে, মাথায় বসবে কাপড় কিংবা টুপি, পিঠে হাত বুলিয়ে কিছু ফাঁপা প্রতিশ্রুতিও দেয়া হবে। ক্ষমতার লড়াইয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজপথের দখল নিতে ইসলামী দলের কর্মী কিংবা মাদ্রাসাছাত্রদের গুটি হিসেবে ব্যবহার করা হবে। তারপর ক্ষমতা পাকাপোক্ত হবার পর সব কিছু বদলে যাবে। কোন বিদেশী প্রভু হয়তো "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" ঘোষণা করবে। আরেক প্রভু হয়তো "অখন্ড ভারত" এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চাইবে। আর প্রভুদের খুশি করতে গিয়ে বলির পাঁঠা বানানো হবে ইসলামপন্থীদের। গতকালের মিত্ররা সক্রিয় শত্রু হয়ে যাবে। এমনটাই হবে, এমনটাই হয়ে এসেছে।

এই চক্র ভাঙ্গতে হবে। এবং এই চক্র ভাঙ্গা সম্ভব, বিইযনিল্লাহ।

চিন্তা করে দেখুন বাংলাদেশের মুসলিমদের কাছে কী কী রিসোর্স আছে।

> আমাদের আছে একটি পূর্ণাঙ্গ নৈতিক, আত্মিক, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা—ইসলামী শরীয়াহ। অর্থাৎ বিদ্যমান কলুষিত ব্যবস্থার রেডিমেইড বিকল্প আমাদের হাতে আছে। এবং এটি হল এমন বিকল্প যা পরিপূর্ণ ও প্রমাণিত। এটি নিছক তাত্ত্বিক বা কাল্পনিক কিছু না। এই ব্যবস্থা প্রবল প্রতাপের সাথে একসময় বিশ্বকে শাসন করেছে, জন্ম দিয়েছে হাজার বছরের চোখধাঁধানো সভ্যতার। এবং আজো এই ব্যবস্থা বাস্তবায়নযোগ্য।
>
> আমাদের পেছনে ইতিহাস আছে। আছে এই বাংলাতেই সাড়ে পাঁচশো বছরের বেশি মুসলিম শাসনের ঐতিহ্য।
>
> আমাদের আছে এমন এক আকীদাহ যা আসমান ও যমীনের সব কিছুর চেয়ে বেশি দামি। যার জন্য হাসিমুখে মানুষ জানমাল কুরবান করতে পারে। এমন আকীদাহ যা পৃথিবীকে শাহাদাতের মর্যাদা আর অর্থ শিখিয়েছে।
>
> আমাদের আছে জনশক্তি। সেক্যুলার রাজনৈতিক দলগুলো কোটি কোটি টাকা খরচ করে জনসমাগম করতে হিমশিম খেয়ে যায়। রাজপথের দখল নেয়ার জন্য তাদের নিতে হয় নানা চিন্তা, পরিকল্পনা আর প্রস্তুতি। অন্যদিকে যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) এর দিকে আহ্বান করা হয় তখন মাদ্রাসার ছাত্র হোক কিংবা সেক্যুলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, মুমিনরা দলে দলে রাস্তায় নেমে আসে। তাও বিনা খরচে, কোন সমন্বয় কিংবা পরিকল্পনা ছাড়াই।
>
> আমাদের সাথে তরুণরা আছে, আছেন প্রাজ্ঞ আলিমরাও।
>
> এবং সবার প্রথমে এবং সবার শেষে আমাদের সাথে আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ জাল্লা ওয়া 'আলা আছেন। নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের মাওলা আর কাফিরদের কোন মাওলা নেই।

এতো কিছুর থাকার পরও আমরা যদি ইসলামকে সমাজের প্রধান শক্তি হিসেবে হাজির করতে না পারি, এ মাটিতে মুসলিম পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি, তাহলে এর দায় পুরোপুরি আমাদের। এটা আমাদের চিন্তার দুর্বলতা, কল্পনার অক্ষমতা, সদিচ্ছার অভাব এবং নিজেদের অযোগ্যতা ছাড়া আর কিছু না। এবং আমাদের এমন অযোগ্যতা এবং ব্যর্থতা ইতিহাস হয়তো ক্ষমা করবে না।

যা কিছু দরকার তার অনেক কিছুই আমাদের আছে। এখন প্রয়োজন উদ্যোগ, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টা, হিম্মত, সবর, হিকমাহ, তাওয়াক্কুল, ইখলাস, কুরবানী এবং তাকওয়ার।

আমাদের সম্পদ ও সামর্থ্য এতো দিন আমরা অন্যদের পেছনে খরচ করেছি। আমরা হয়েছি অন্যদের স্বার্থসিদ্ধি আর ক্ষমতায় চড়ার সিড়ি। আমাদের যমিনে আমাদের সামনেই গড়ে তোলা হয়েছে কুফরের প্রাসাদ। আমাদের মিনারগুলোর ওপর ওড়ানো হয়েছে বিজাতীয় আদর্শের নিশান। আর আজ পুরো কওম, পুরো সমাজ, পুরো জাতিকে এর কুফল ভোগ করতে হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক ভুল শোধরানোর সময় হয়েছে। সময় হয়েছে ইতিহাসের দেয়া দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার।

যদি আমরা না হই, তাহলে কারা?

যদি এখন না হয়, তাহলে কখন?

***

সমুদ্রে স্রোত আসবেই। কিন্তু সমুদ্র পাড়ি দিতে হলে অনাগত স্রোতের ভরসায় বসে থাকা যায় না। গন্তব্যহীনের মতো নিজেকে স্রোতের ওপর ছেড়েও দেয়া যায় না। হ্যা, স্রোত আসবে। কিন্তু সেই অন্ধ স্রোতকে পথ দেখাতে হবে। পরিচর্যা করে তাকে আরও শক্তিশালী, আরও ব্যাপক, আরও সর্বগ্রাসী করে তুলতে হবে। তারপর স্রোতের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এগোতে হবে গন্তব্যের দিকে। এই সক্ষমতা এবং দক্ষতা রাতারাতি তৈরি হবে না। তা গড়ে তুলতে হবে ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে।

প্রয়োজনীয় সব উপাদান আমাদের সাথেই আছে, আলহামদুলিল্লাহ। এখন প্রয়োজন সেই অগ্রগামী দলের, সেই নাবিকদের, দুর্গম সমুদ্র পাড়ি দেয়ার স্পর্ধা দেখানো সেই অভিযাত্রিকদের, যারা কওমকে পথ দেখিয়ে গন্তব্যে নিয়ে যাবে।

কাজটা সহজ না। কাজটা সস্তা না। এমন যাত্রায় অবধারিতভাবেই মুখোমুখি হতে হয় ঝড়-ঝঞ্ঝার। দিতে হয় চড়া মূল্য। এটাই ইতিহাসের রীতি, এটাই পরিবর্তনের দাম। এবং এই দাম অন্যায্য না। অগ্নিকুণ্ডের তীব্র উত্তাপেই লোহা ইস্পাতে পরিণত হয়। স্বর্ণকে শুদ্ধ হতে হয় আগুনে পুড়েই।

আমি আশা করি এই আলোচনা অভিযাত্রিকদের সেই পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতে, দেখাতে এবং তা বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করবে।

নিঃসন্দেহে সাফল্য ও তাওফীক কেবল আল্লাহরই পক্ষ থেকে। এই আলোচনায় যদি কল্যাণকর কিছু থেকে থাকে তাহলে তা কেবল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর এতে যা কিছু ভুলভ্রান্তি এবং অকল্যাণ রয়েছে তা আমার এবং শয়তানের পক্ষ থেকে।

নিশ্চয় সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের ওপর।